# মুন্সিগঞ্জের বালুমহাল লুটপাটের রামরাজত্ব

**খোন্দকার তানভীর জামিল ও মোস্তফা সারোয়ার বিপ্লব**

মেঘনা নদীতে অবৈধভাবে প্রতিদিন ১ কোটি টাকার বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এর ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। আর অবৈধভাবে বালু কাটায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা সেতু এখন হুমকির সম্মুখীন। এছাড়াও নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার ৪টি এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ৫টি গ্রাম নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। অবৈধ বালু উত্তোলনকারী সিন্ডিকেটগুলো এতোই প্রভাবশালী যে তাদের বাধা দিতে গেলে গ্রামবাসীকে মামলা-হামলা, এমনকি হত্যারও হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, সোনারগাঁ এবং গজারিয়া উপজেলার বালুমহালগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে স্থানীয় বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন নেতা এবং তাদের সন্ত্রাসী বাহিনী। এর মধ্যে সোনারগাঁয়ের মোতালেব মেম্বার এবং নাসির মেম্বার স্থানীয় সাংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রেজাউল করিমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। গজারিয়ার বালু সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রক মুন্সিগঞ্জ জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক এবং ইমামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মজিবর রহমান জমাদ্দার। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে কথা বলার সময় সে নিজেকে মুন্সিগঞ্জ-৪ আসনের বিএনপি সাংসদ আব্দুল হাইয়ের 'রাজনৈতিক দক্ষিণ হস্ত' বলে দাবি করে। মূলত বালু সিন্ডিকেটগুলো প্রতিমন্ত্রী এবং সাংসদের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তারা খুব সহজেই স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করে মেঘনা নদীর সোনারগাঁ এবং গজারিয়া অংশে যত্রতত্র অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছে। অবশ্য এর বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কর্মকর্তারা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। এই টাকার একটি মোটা অংশ বালু সিন্ডিকেটগুলো তাদের পৃষ্ঠপোষকদের নিয়মিত পৌঁছে দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মূলত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মহলের যোগসাজশেই মেঘনা নদীতে অবৈধ বালু উত্তোলন চলছে।

### অবৈধ বালু উত্তোলন হচ্ছে যেভাবে

নব্বই দশকের প্রথম দিকে বালুমহাল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বার্ষিক ভিত্তিতে ইজারা (বা লিজ) দেয়া হতো। সাধারণত প্রতিটি বালুমহালের আয়তন হয় ১০ থেকে ৩০ হেক্টর। ইজারাদারকে মৌজা ম্যাপসহ সরেজমিনে ব্যাপক পরিমাপ করে লাল পতাকা দ্বারা তার বালুমহালের সীমানা চিহ্নিত করে বুঝিয়ে দেয়া হয়। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে বালুমহালের দায়িত্ব পায় খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো। তবে একই ইজারা পদ্ধতি বহাল থাকে। কিন্তু ঢাকা থেকে বছরে একবার ইজারা দেয়ার পর ব্যুরোর কোনো কর্মকর্তা বালুমহালগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন না করায় শুরু হয় অবৈধ বালু উত্তোলন ।

সরেজমিনে ঘুরে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অধিকাংশ বালু ব্যবসায়ী ইজারা নেয়ার দুই-তিন মাস পরেই তার বালুমহালের সীমানার বাইরে শত শত হেক্টর জায়গা থেকে বালু উত্তোলন করে। এমনকি নদীর পাশে জেগে ওঠা চরের হাজার হাজার হেক্টর ফসলি জমির মাটিও কেটে নেয়া হয়। এর ফলে গত আট বছরে ছয়টি গ্রামের একাংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এগুলো হলো সোনারগাঁয়ের ভাটি বন্দর, চর লাউদিয়া, জিয়ানগর, বুড়বুড়িয়া এবং গজারিয়ার চর বলাকি, বলাকি গ্রাম। অবাধে বালু কাটার ফলে পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হচ্ছে নদীর মৎস্য সম্পদ। এরপরও অবৈধ বালু উত্তোলন চলছে অপ্রতিরোধ্যগতিতে। কেবল সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে বালুমহালের নিয়ন্ত্রণকারী সিন্ডিকেটের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে।

গত চার বছর ধরে সোনারগাঁ এবং গজারিয়ার বালুসিন্ডিকেটগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে স্থানীয় বিএনপি এবং এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা । তারা নিজে বা ভাইয়ের নামে অথবা বালু ব্যবসায়ীদের পার্টনার হিসেবে বালুমহালের ইজারা নেয়। এই নেতাদের বালু সিন্ডিকেটগুলোই ২০০৩ সালে খনিজসম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক সর্বশেষ টেন্ডারে সোনারগাঁ এবং গজারিয়ার বালুমহালগুলো বার্ষিক ভিত্তিতে ইজারা পায়। মেয়াদ শেষে তারা ইজারা নবায়নের জন্য ব্যুরোতে আবেদন জানায়। কিন্তু গত বছর মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে বালুমহালের দায়িত্ব খনিজসম্পদ থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয় (স্মারক নং- মপব ১-১-০৪বিধি/৯৫ তাং ৩০-৯-০৪)। এর ফলে নবায়নের বিষয়টি ঝুলে পড়ে। এ অবস্থায় ইজারাদাররা নবায়নের ব্যাপারে হাইকোর্টে রিট করে। এরপর তারা স্থিতাবস্থার আবেদন জানালে হাইকোর্ট তা মঞ্জুর করেন এবং তাদের নিজ নিজ বালুমহাল থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে বালু উত্তোলনের নির্দেশ দেন। কিন্তু গত ৩০ এপ্রিল সোনারগাঁয়ের বালুমহালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এক সংঘর্ষে একজন নিহত এবং ৫০ জন আহত হয়।

### সোনারগাঁ : খুনোখুনি চলছেই

মেঘনা নদীর সোনারগাঁ অংশে বালুমহালগুলো হচ্ছে নয়নপুর, চর কিশোরগঞ্জ এবং চরহোগলা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এগুলোতে অবাধে বালু উত্তোলনের ফলে ভাঙনের কবলে পড়ে

সোনারগাঁ উপজেলার জিয়ানগর, চরলাউদিয়া, ভাটিবন্দর, বিরিষাগাঁও এবং বৈদ্যের বাজার। এই পাঁচটি গ্রামের একাংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এ অবস্থায় ২০০০ সালের এপ্রিলে গ্রামগুলোর জনসাধারণ গঠন করে 'চরকাটা প্রতিরোধ সংগ্রাম কমিটি'। এর উদ্যোগে সভা ও বিক্ষোভ মিছিল করে সোনারগাঁয়ের তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিল্লুর রহমানকে একটি স্মারকলিপি দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা তদন্ত করে ১০৭টি পরিবারের লিখিত অভিযোগের সত্যতা পেয়েছি এবং তিনটি প্রতিষ্ঠানকে বালু না কাটার জন্য চিঠি দিয়েছি। সরকারের উর্ধ্বতন মহলকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও চর কেটে বালু উত্তোলন বন্ধ হচ্ছে না। (প্রথম আলো, ৪ মে ২০০০)

২০০১ সালের অক্টোবরে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সোনারগাঁ উপজেলার চরহোগলা ও চরকিশোরগঞ্জের বালুমহালগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেয় শম্ভুপুরা ইউনিয়নের মোতালেব মেম্বার এবং মান্নান গ্রুপ। এ দুটি গ্রুপই বিএনপির সমর্থক এবং স্থানীয় সাংসদ ও প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রেজাউল করিমের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। বালুমহাল নিয়ে এ দুটি গ্রুপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ২০০১ সালের ডিসেম্বরে। এ সময় সোনারগাঁ থানায় দুটি মামলা হয়। পরে বিএনপির স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের মধ্যস্থতায় বালু তোলার সীমানা নির্ধারণের মাধ্যমে দু'পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া হয়। কিন্তু এর দুই মাস পরেই ২০০১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দুই গ্রুপের মধ্যে চরহোগলা গ্রামে তিন ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে নারী ও শিশুসহ ৪৫ জন আহত হয়।

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে মেঘনা নদীর চরহোগলা এবং চরকিশোরগঞ্জ বালুমহালের অবৈধ বালুকাটা নিয়ে শম্ভুপুরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ, বিএনপির আলমগীর আলম এবং নূর গাজীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিনজনের পক্ষেই নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ থেকে ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা এসে অস্ত্রের মহড়া দেয়। এ সময় সংঘর্ষ এড়াতে সোনারগাঁ এবং গজারিয়া থানা পুলিশ প্রতিদিন নদীতে টহল দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু দুই মাস পরেই চারহোগলা এবং চর কিশোরগঞ্জের বালুমহালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিএনপির বিবদমান দুটি গ্রুপের মধ্যে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়, যা টানা তিন মাস চলে। এর মধ্যে একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেয় শম্ভুপুরা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার নাসির উদ্দিন। আর তার প্রতিপক্ষ সাবেক ইউপি মেম্বার মোতাবেল মিয়া। তাকে সমর্থন করে বারেক মাতবর।

স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২০০৩ সালের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনে মেম্বার পদে চরহোগলা গ্রামে বিএনপির দুই নেতা নাসির উদ্দিন এবং তৎকালীন মেম্বার মোতালেব মিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে মোতালেব মিয়াকে সমর্থন দেয়

*মেঘনা নদীতে চলছে অবৈধ বালু উত্তোলন*

বারেক মাতবর এবং তাকে ভোট দেয়ার জন্য গ্রামবাসীকে নির্দেশ দেয়। অন্যথায় পরিণতি খারাপ হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। কিন্তু গ্রামবাসীর ভোটে নাসির উদ্দিন ইউপি মেম্বার

*অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম*
*মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী*

নির্বাচিত হলে বারেক মাতবরের লোকজন অক্টোবর পর্যন্ত আট দফা হামলা চালায় চরহোগলা এবং চরকিশোরগঞ্জ গ্রামে। ৬ নবেম্বর রাতে বারেক মাতবর ওরফে বোমা বারেক ও তার তিন ছেলে মহিউদ্দিন, ইয়াননবী এবং তৈয়ব আলীসহ শতাধিক সন্ত্রাসীর হামলায় নারী, পুরুষ ও শিশুসহ আহত হয় ৩০ জন।

কিন্তু সোনারগাঁ থানা পুলিশ কোনো ব্যবস্থা না নিলে দুই গ্রামবাসী এক হয়ে ৭ নবেম্বর স্থানীয় সাংসদ ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিমের ঢাকার বাসায় গিয়ে তাকে অবহিত করেন। তাদের কথা শুনে মন্ত্রী থানায় মামলা করার নির্দেশ ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু বালুমহালের নিয়ন্ত্রণ এবং এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুটি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ চলতেই থাকে। এতে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। ১৫ নবেম্বর পর্যন্ত উভয়পক্ষ এ ব্যাপারে সোনারগাঁ থানায় পর পর ৭টি মামলা দায়ের করে।

সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে ২০০৩ সালের ১৭ নবেম্বর। ওই দিন সকালে চরহোগলা গ্রামে নাসির মেম্বারের লোকজনের ওপর হামলা চালায় বারেক-মোতালেব গ্রুপ। তাদের সহযোগিতা করে মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড কমিশনার ও শহর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শহীদ ওরফে শহীদ কমিশনারের ভাই বজলু এবং ভাগিনা এনামুলসহ ৫০-৬০ জন সন্ত্রাসী। গ্রামবাসী রুখে দাঁড়ালে বারেক-মোতালেব-শহীদ কমিশনার গ্রুপ পিছু হটে চরহোগলা এবং মুন্সিগঞ্জের ইসলামপুর গ্রামের মাঝখানে অবস্থান নেয়। এ সময় মুন্সিগঞ্জ থানার তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী, শহর বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ১ নং ওয়ার্ড কমিশনার ভিপি মুকুলের সন্ত্রাসী বাহিনী তাদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। শুরু হয় ভয়াবহ সংঘর্ষ। এতে ১ জন নিহত এবং ২৬ জন আহত হয়। এভাবে ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুটি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে। এতে দুই শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। ১৩ হাজার লোক অধ্যুষিত চরহোগলা এবং চরকিশোরগঞ্জের পুরুষরা সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে যায়। এর মধ্যেই ২০০৩ সালের নবেম্বর ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়। সোনারগাঁ উপজেলার বালুমহালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সর্বশেষ সংঘর্ষ হয় এ বছরের ৩০ এপ্রিল। মোতালেব মেম্বার এবং নাসির মেম্বার গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে গত ৪ বছরে দুজন নিহত এবং পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়।

বর্তমানে চরকিশোরগঞ্জ এবং চরহোগলার বালুমহালগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে মোতালেব মেম্বার। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, দুই শতাধিক ড্রেজার এবং তিন শতাধিক ট্রলার দিয়ে যত্রতত্র অবৈধভাবে বালু কাটা হচ্ছে। এ সম্পর্কে মোতালেব মেম্বার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে বালুমহালগুলো থেকে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। আর নাসির মেম্বারের সঙ্গে বিরোধ মিটে গেছে।' কিন্তু স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রেজাউল করিমের চাপের মুখে মোতালেব মেম্বার এবং নাসির মেম্বার সহাবস্থান করলেও তাদের মধ্যে বিরোধ রয়েই গেছে। এ ব্যাপারে জানতে প্রতিমন্ত্রীর

মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে বলা হয়, 'উনার সঙ্গে দেখা করে কথা বলুন।' এ সময় ফোন রিসিভকারীর পরিচয় জানতে চাইলে লাইন কেটে দেয়া হয়। এই মোবাইল ফোনটি সব সময় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রেজাউল করিমই ব্যবহার করে থাকেন বলে তার ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে।

**গজারিয়া : হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে চলছে বালু উত্তোলন**

মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় মেঘনা নদীর ৪টি বালুমহাল হচ্ছে চরবেতাগী, সিকিরগাঁও, চরবাউশিয়া এবং রায়পুরা। ১৬টি মৌজায় বালুমহালের আয়তন ৮২০ হেক্টর। সবগুলো বালুমহালের ইজারা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। তবে হাইকোর্টের রিট করে বর্তমানে ৭টি প্রতিষ্ঠান বালু কাটছে। এগুলো হচ্ছে- হিমা কনস্ট্রাকশন, সামসুদ্দীন এন্টারপ্রাইজ, আজাদ কনস্ট্রাকশন, ইমন কনস্ট্রাকশন, হক ট্রেডার্স, দীনা ট্রেডার্স এবং বিপ্লব ট্রেডার্স। এদের অধীনে রয়েছে প্রায় ২০০ হেক্টর বালুমহাল।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে স্থানীয় প্রশাসন বাকি ৬০০ হেক্টর বালুমহাল প্রথমে খাস কালেকশন এবং গত ১১ আগস্ট ইজারা দেয়ার উদ্যোগ নেয় । কিন্তু দীনা ট্রেডার্সের দেলোয়ার হোসেন হাইকোর্টে পরপর দুটি রিট করলে এগুলো স্থগিত হয়ে যায়। সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে তারা গজারিয়ার ৮২০ হেক্টর বালুমহাল থেকেই অবাধে বালু তুলছে। এর নেতৃত্ব দিচ্ছে যুবদল নেতা ও ইমামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মজিবর রহমান জমাদ্দার। তবে মেঘনা নদীর গজারিয়া অংশে বালুমহালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চেয়ারম্যান মজিবরের সাথে যুবদল নেতা হুমায়ুন কবির খান ও বিএনপি নেতা দেলোয়ার হোসেনের মধ্যেও বিরোধ আছে ।

হিমা কনস্ট্রাকশনের মালিক চেয়ারম্যান মজিবরের ভাই মিজানুর রহমান জমাদ্দার। তার অন্যতম পার্টনার হচ্ছে গজারিয়া থানা যুবদলের সভাপতি হুমায়ুন কবির খান। এই দু'জন গুয়াগাছিয়া ইউয়িনের চরবাউশিয়া মৌজার আশপাশের এলাকা থেকে অবাধে বালু কাটছে। বালু বিক্রির টাকা তোলে গজারিয়া থানা ছাত্রদলের সহসভাপতি তাবারক, মুক্তার,পারভেজ। তবে হাইকোর্টের নির্দেশ পেলেও চরবাউশিয়া মৌজার ১নং সিটে বালু কাটতে পারছেন না সামসউদ্দিন ট্রেডার্সের এসএম জাহাঙ্গীর মাহবুব। গত ৭ আগস্ট তার লোকজনকে মারপিট করে তাড়িয়ে দেয় পার্শ্ববর্তী দাউদকান্দি উপজেলার যুবদল নেতা পিটার-বাসেতের সন্ত্রাসীবাহিনী। এব্যাপারে পিটার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ সাহেব নির্দেশ দিয়েছেন, এখানে কেউ বালু কাটতে পারবে না। তাই আমরা বাধা দিয়েছি।' হাইকোর্টের রিট প্রসঙ্গে সে আরো বলে, হাইকোর্ট যাই বলুক, মন্ত্রী সাহেবের কথাই ফাইনাল। এরপর বালু কাটতে আসলে মাহবুবরে ভালা মতন ঘাড়াইয়া দিমু। তখন সাংবাদিকগো লগে কথা কওনের মজা বুঝবো।'

*আব্দুল হাই এমপি*

*চেয়ারম্যান মজিবর রহমান জমাদ্দার*

হোসেন্দী ইউনিয়নের চরবেতাগী এবং সিকিরগাঁও মৌজায় বালুমহালগুলোর নিয়ন্ত্রণ করছে দীনা ট্রেডার্স এবং বিপ্লব টেডার্স। এ দুটির মালিক যথাক্রমে দেলোয়ার হোসেন এবং বেলায়েত হোসেন দু'সহোদর। এদের অধীনে ২৫ হেক্টর বালুমহাল আছে । দেলোয়ারের অন্যতম পার্টনার হচ্ছে চরবলাকি গ্রামের গিয়াসউদ্দিন। সে মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও চাঁদপুর জেলার নৌপথে চোরা কারবারিদের গডফাদার হিসেবে পরিচিত। এখান থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের টাকা তুলে থানা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অহিদুজ্জামান, থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি রিপন, হোসেন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, গজারিয়ার বালুমহালগুলো থেকে টাকা তোলার পর তা চলে যায় বালু সিন্ডিকেটের হাতে। এই সিন্ডিকেটে রয়েছে যুবদল নেতা চেয়ারম্যান মজিবর রহমান জমাদ্দার, তার ভাই মিজান, হুমায়ুন কবির খান, গিয়াসউদ্দিন, মুন্সিগঞ্জ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম মাসুম, গজারিয়া থানা যুবদলের সহসভাপতি তপন চৌধুরী, থানা বিএনপির সহসভাপতি এবং দীনা ট্রেডার্সের মালিক দেলোয়ার হোসেন, তার ভাই ও বিপ্লব ট্রেডার্সের মালিক বেলায়েত হোসেন, হোসেন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামাল মেম্বার, রঘুরচরের যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর ওরফে চরের জাহাঙ্গীর, আশরাফদি গ্রামের মরহুম নূর হোসেন ডাক্তারের ছেলে খোকন গজারিয়া থানার তালিকাভুক্ত চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং অস্ত্র মামলার আসামি মোমিনুল হক টিটু।

সরেজমিনে ঘুরে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চেয়ারম্যান মজিবরের নেতৃত্বাধীন বালু সিন্ডিকেট মেঘনা নদী গজারিয়া অংশে ২০০ ড্রেজার এবং সহস্রাধিক বলগেট দিয়ে প্রতিদিন ৭০ থেকে ৮০ লাখ টাকার বালু উত্তোলন করছে অবৈধভাবে। রাতের বেলায় হোসেন্দী, রঘুরচর, ইসমানিরচর, গোয়ালগাঁও, চরবলাকি, ভাটি বলাকি, ভবানীপুর গ্রামের পাশে অবাধে বালু কাটা হয় বলে স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ করেছেন। এর ফলে গ্রামগুলো নদী ভাঙনের কবলে পড়েছে। কিন্তু চেয়ারম্যান মজিবর এবং তার সন্ত্রাসী বাহিনীর ভয়ে কেউ প্রতিবাদও করতে পারছে না।

অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের পর বিক্রি করে যে বিপুল পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়, তার একটি মোটা অংশ স্থানীয় সাংসদ আবদুল হাইকে দেয়ার নামে চেয়ারম্যান মজিবর নেয় বলে অভিযোগ আছে। তবে সে এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি গজারিয়া থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম পিন্টু এবং থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নাসির উদ্দিন মিয়াজীর অপপ্রচার এবং ষড়যন্ত্রের শিকার।' এ ব্যাপারে সিরাজুল ইসলাম পিন্টু সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'চেয়ারম্যান মজিবরের নামে বালুমহালে লুটপাট, গজারিয়া থানা এলাকায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির অভিযোগগুলো শত ভাগ সত্য। সুতরাং তার বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রশ্নই আসে না।' আর নাসির উদ্দীন মিয়াজী বলেছেন, 'আমার প্রায় ৪০ লাখ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সন্ত্রাসী চেয়ারম্যান ও যুবদল নেতা মজিবরের কারণে হুমকির সম্মুখীন। সে আমাকে যেকোনো সময় হত্যা করতে পারে। আমি এ ব্যাপারে গজারিয়া থানায় একাধিক জিডিও করেছি। মজিবর সিন্ডিকেট মেঘনা নদীতে বালু উত্তোলনের নামে লুটপাট করছে এ কথা সবাই জানে।'

গজারিয়ার অধিকাংশ বালুমহালই পড়েছে হোসেন্দী ইউনিয়নে। এই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন মন্টু সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'যুবদল নেতা চেয়ারম্যান মজিবর, মিজান, হুমায়ুন কবির খান, বিএনপি নেতা দেলোয়ার হোসেন, বেলায়েত হোসেন, গিয়াসউদ্দীনের নেতৃত্বে একটি প্রভাবশালী বালু সিন্ডিকেট অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছে। অনেক চেষ্টা করেও আমি তাদের প্রতিরোধ করতে পারিনি।' অভিযোগ আছে, বিএনপি দলীয় সাংসদ আবদুল হাইয়ের শেল্টারে যুবদল নেতা চেয়ারম্যান মজিবর বালুমহালে লুটপাট করেছে। এ ব্যাপারে সাংসদ আবদুল হাই সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'দেশে তো কোনো খবর নাই। আর আপনাগোও কোনো কাম নাই। তাই যা অভিযোগ পাইছেন, সব লিখা দেন। বাকিটা পাবলিকে বুঝবো।' এরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুধু মুখেই বলছেন না, কাজেও প্রমাণ রাখছেন। তারা সবাই মিলে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক রামরাজত্ব।